রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্য : একটি নিরীক্ষণ

অরূণকুমার বসু

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা থেকেই গদ্যে ও ছন্দে লিখিত পদ্য বন্ধে অকাতরে আত্মপ্রকাশের দীক্ষা লাভ করেছিলেন। বরং কবিতার নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় চর্চার পূর্বেই তথ্যমূলক প্রবন্ধ লেখার অভ্যাস তৈরি হয়েছিল তার। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছিল তাঁদের পারিবারিক পত্রিকা। তাই প্রকাশের জন্যে তাঁর ভাবনাচিন্তার কারণ ঘটেনি। তারপর থেকে কবিতার প্রায় সমান্তরালেই তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ জাতীয় গদ্য লিখে প্রকাশ করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক পরিচয় তাঁর সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় পরিমাণে ও বৈচিত্র্যে কম বিস্ময়কর নয়। রবীন্দ্রনাথ আত্মপরিচয়ে সর্বাগ্রে কবি হলেও, তিনি বাঙলার শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, শ্রেষ্ঠ গীতিকার-সুরকার এবং শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিকও। ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে যে রচনাবলী - সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে দেখা যাচ্ছে, কবির সমগ্র কবিতা ও গান মুদ্রণের জন্য লেগেছে কমবেশি তিন - হাজার আটশো পৃষ্ঠা। গল্প -উপন্যাসের মোট মুদ্রিত পরিমাণ দু'হাজার সাতশো পৃষ্ঠা। নাটক ছাপা হয়েছে দু'হাজার পৃষ্ঠায়। তুলনায় প্রবন্ধের জন্য লেগেছে চার হাজার নয়শো-র মতো পৃষ্ঠা। নিঃসন্দেহে এই আয়তনে রবীন্দ্রনাথের অসংকলিত, বর্জিত বেশ কিছু প্রবন্ধ বা ওই জাতীয় রচনা এবং পুরো চিঠিপত্র - জাতীয় গদ্যলেখা বাদ পড়ে গেছে। তবু এই পৃথুল কলেবর রবীন্দ্রনাথের সমগ্র প্রবন্ধ সাহিত্যের ব্যাপ্তির সীমানাটিকেই চিহ্নিত করে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সাহিত্য সংসদ - প্রকাশিত বঙ্কিম - গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র বঙ্কিম প্রবন্ধের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমবেশি নয়শো পঞ্চাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের মোট প্রবন্ধগ্রন্থের সংখ্যা কবির জীবিতকালে প্রকাশের ধারাবাহিকতার দিক থেকে ষাটটির মতো, যদিও এর অনেকগুলি পরবর্তীকালে প্রত্যাহৃত অথবা অন্য নামে রূপান্তরিত হয়েছে। যদি পত্রজাতীয় রচনাকেও একপ্রকার প্রবন্ধের মূল্য দেওয়া যায় এবং রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেওয়াই সংগত, তাহলে তাঁর প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' কবির কুড়ি বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। এর পরে ১৯০০ সলের মধ্যে 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'রামমোহন রায়' (পুস্তিকা আকারে), 'আলোচনা', 'চিঠিপত্র', 'সমালোচনা', 'মন্ত্রি-অভিষেক' (পুস্তক), 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি', 'পঞ্চভূত' প্রভৃতি প্রবন্ধ - গদ্যগ্রন্থ পুস্তিকা মুদ্রিত হয় এদের মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থাকারে প্রচলিত, অন্যগুলি তাঁর নানা প্রবন্ধগ্রন্থের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে গেছে। যেন 'চিঠিপত্র', 'গদ্যগ্রন্থাবলী'র 'সমাজ' (১৯০৮ অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'মন্ত্রি-অভিষেক' 'রাজাপ্রজা'-র সঙ্গে মিশে গেছে। এই সময় কালে প্রকাশিত প্রবন্ধের তুলনামূলক হিসেবটা এইরকম দাঁড়াবে : কাব্য ১৭, গীতিনাট্য - নাট্যক ১২, গল্প উপন্যাস ৭ এবং গ্রন্থ-প্রবন্ধ ১০। ১৯০১ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে কবির প্রবন্ধগ্রন্থের তালিকা স্বভাবতই স্ফীততর হয়েছে, তাঁর চিন্তা-মনন ও যুক্তিভাবনার সাম্রাজ্যসীমা প্রসারিত হয়ে। এই পর্বের প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে চটি পুস্তিকাও আছে, অনতিহ্রস্ব সংকলনও আছে। যথা, 'উপনিষদ্ ব্রহ্ম', 'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'চারিত্রপূজা', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', পাবনা সম্মিলনীতে প্রদত্ত 'সভাপতির অভিভাষণ' (পরে 'সমূহ' - গ্রন্থের অন্থর্ভুক্ত), 'রাজাপ্রজা', 'সমূহ', 'স্বদেশ', 'সমাজ', 'শিক্ষা', 'শব্দতত্ত্ব', 'ছিন্নপত্র' (আপাতত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-জাতীয় রচনারই অন্তর্ভুক্ত ধরা হল), 'সঞ্চয়', 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'জাপানযাত্রী' এবং 'সংকলন' (১৯২৫ সালে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, পত্র, ডায়ারি ও কথিকা-র এই সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়)। তুলনামূলক হিসেবে প্রবন্ধেরই আপেক্ষিক গুরুত্ব, কারণ এই পঁচিশ বছরে মোট প্রবন্ধ-জাতীয় সংখ্যা ৩০, কাব্য ২০, নাট্যরচনা ১৭ এবং গল্প উপন্যাস ১২। ১৯২৬ থেকে ১৯৪১ কবির জীবনের এই শেষ পনেরো বছরের হিসাবে গদ্য - নিবন্ধ - প্রবন্ধের সংখ্যা ২০, কাব্য ২৪, গল্প-উপন্যাস ৮, নাট্য-জাতীয় রচনা ১৮। প্রবন্ধ ও গদ্যগ্রন্থে কিছু পুনঃপ্রকাশিত গ্রন্থ আছে। পূর্বযুগের রচনাই নতুন করে হয়ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এইসব ধরেই তালিকাভুক্ত বইগুলি 'যাত্রী' ('পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' ও 'জাভাযাত্রীর পত্র' একত্রে), 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', 'রাশিয়ার চিঠি', 'মানুষের ধর্ম', 'ভারতপথিক রামমোহন রায়', 'শান্তিনিকেতন' দুই খণ্ড, 'সুর ও সংগতি' (ধূর্জটিপ্রসাদের রচনাসহ), 'ছন্দ', 'জাপানে - পারস্যে', 'সাহিত্যের পথে', 'প্রাক্তনী', 'কালান্তর', 'বিশ্বপরিচয়', 'পথে ও পথের প্রান্তে', 'বাংলাভাষা পরিচয়', 'পত্রধারা' ('ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ও 'পথে ও পথের প্রান্তে' একত্রিত), 'পথের সঞ্চয়' (১৯১২-১৩ সালে লেখা চিঠিপত্র সংকলন), 'সভ্যতার সংকট', 'ছেলেবেলা' ('জীবনস্মৃতি' - কে যে অর্থে গদ্য-প্রবন্ধ বলা হয়েছে সে অর্থেই 'ছেলেবেলা' বইটিকে এখানেই

রাখা হল), 'আশ্রয়ের রূপ ও বিকাশ' ইত্যাদি। এই তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের মোট প্রবন্ধের সংখ্যা সাড়ে সাতশোরও বেশি। কিন্তু হিসাব এখানেই শেষ নয়। কবির মৃত্যুর পর বিশ্বভারতী তাঁর গ্রন্থান্তর্গত হয়নি এমন বহু প্রবন্ধের সন্ধান দিয়ে এবং অন্য ধরনের প্রসঙ্গসূত্রে পুনঃপ্রকাশিত কিছু প্রবন্ধের সাহায্যে আরো কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশ করেছেন। যেমন 'আত্মপরিচয়', 'অরবিন্দ ঘোষ', 'খৃষ্ট', 'বুদ্ধদেব', 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ', 'মহাত্মা গান্ধী', 'ইতিহাস', 'কবির ভণিতা', 'পল্লীপ্রকৃতি', 'সমবায়নীতি', 'সংগীতচিন্তা', 'সাহিত্যের স্বরূপ, 'বিশ্বভারতী' ইত্যাদি। চিঠিপত্রের পরিমাণও ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সে তালিকা ধরলে প্রাবন্ধিক গদ্যরচয়িতারূপে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আমাদের বিস্ময় - পরিধিকেও অতিক্রম করে যাবে। কবি রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনব্যাপ্ত এই বিপুল গদ্যনিবন্ধ বাংলা সাহিত্যের সর্বকালের দশজন শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিকের সমগ্র প্রবন্ধকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে হয়।

বিষয়বৈচিত্র্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বিস্ময়করভাবে সমৃদ্ধ। যে-কোনো বিষয়বস্তু অবলম্বনে লিখিত চিন্তাশীল গদ্যরচনাকেই যদি প্রবন্ধ বলি, তাহলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিষয়সূচী সংখ্যাগণনার প্রত্যাশা অতিক্রম করে যেতে পারে। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ তাঁদের গ্রন্থতালিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ গ্রন্থের স্থূল বিভাগ-নির্দেশ করেছেন যথাক্রমে জাতীয় আদর্শ (কালান্তর, সভ্যতার সংকট, স্বদেশ), জীবনকথা (অরবিন্দ ঘোষ, আত্মপরিচয়, খৃস্ট, চারিত্রপূজা, ছেলেবেলা, জীবনস্মৃতি, বুদ্ধদেব, বিদ্যাসাগরচরিত, ভারতপথিক রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী), ধর্ম (ধর্ম, মানুষের ধর্ম, শান্তিনিকেতন, সঞ্চয়), বিজ্ঞান (বিশ্বপরিচয়), ভাষা ও সাহিত্য (আধুনিক সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য, বাংলাভাষা- পরিচয়, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ), ভ্রমণ-কথা (জাপানযাত্রী, জাভাযাত্রীর পত্র, পথের সঞ্চয়, পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, পারস্যযাত্রী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি, রাশিয়ার চিঠি), শিক্ষা (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, প্রাক্তনী, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, শিক্ষা), পত্রাবলী (চিঠিপত্র একাধিক খণ্ড, ছিন্নপত্র, ছিন্নপত্রাবলী, পথে ও পথের প্রান্তে, ভানুসিংহের পত্রাবলী, রবীন্দ্রনাথ - এন্ডরুজ পত্রাবলী) এবং বিবিধ (ইতিহাস, কবির ভণিতা, ছন্দ দীপিকা, পঞ্চভূত, পল্লীপ্রকৃতি, বঙ্গিমচন্দ্র, বিচিত্র প্রবন্ধ, বিচিত্রা, মুকুল, রবীন্দ্রপরিচয়, সংকলন, সমবায়নীতি, স্বদেশী সমাজ, সংগীতচিন্তা) এই নটি শিরোনামে। অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে দেখতে পাই সাহিত্য, ইতিহাস, রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজচিন্তা, অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ছন্দ-ব্যাকরণ - শব্দতত্ত্ব-ভাষাবিজ্ঞান, এই সবই তাঁর প্রবন্ধে বারবার আলোচিত হয়েছে। জীবনী, আত্মজীবনী, ভ্রমণ, শিক্ষানীতিও তাঁর প্রবন্ধের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। তাছাড়া সারা জীবন তিনি এত চিঠিপত্র লিখেছেন এবং সেগুলিতে এত অজস্র বিষয় সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা ধ্যানধারণার প্রকাশ ঘটেছে যে সেগুলিও প্রবন্ধ গৌরব অর্জন করেছে। এক-একটি বিষয়ের মধ্যে আছে বিশুদ্ধ সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা, কবি সাহিত্যিকের মূল্যায়ন, গ্রন্থবিশেষের বিচার বিশ্লেষণ, আধুনিক কাব্যধারা বা কোনো বিশেষ সাহিত্যরীতি সম্পর্কে তাঁর অভিমত, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বা মধ্যযুগীয় সাহিত্য নিয়ে তাঁর বীক্ষণশীল বিচার, ইংরাজি বা অন্যান্য বিদেশীয় সাহিত্য সম্পর্কে মতামত, লোকসাহিত্যের আলোচনা, ছন্দোবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ—কী নেই ভাবা যায় না। শুধু রাজনীতি সমাজবিদ্যা ইতিহাস বিষয়ে সারা জীবন তিনি এত প্রবন্ধ লিখেছেন যে সেইগুলি অবলম্বন করেই আমাদের দেশের গত দু'শতাব্দীর রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস স্পষ্ট করে লেখা যায়।

পনেরো বছর বয়সে গ্রন্থসমালোচনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক জীবনের সূচনা। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ সম্ভবত 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসর সরোজিনী' ও 'দুঃখসঙ্গিনী' নামক তিনটি গ্রন্থের সমালোচনা। এর কিছুকাল পরেই মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা করে একটি দীর্ঘ কঠোর প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি। বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে মহারাষ্ট্রে সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে অবস্থানকালে অগ্রজের গ্রন্থাগারে বহু বিদেশী গ্রন্থ ও কবিসাহিত্যিকের রচনা পাঠ করে তিনি তাঁর কিশোর সারস্বত চিত্তের প্রতিক্রিয়া প্রবন্ধ আকারে ধরে রাখতেন—সেইগুলিও পরে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এইভাবে নানা সময়ে নানা সূত্রে লিখিত একই বিষয়ের বা সমজাতীয় বিষয়ের একাধিক প্রবন্ধ নিয়ে একটি করে গ্রন্থ - প্রকাশের আয়োজন করেছেন কবি— তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত এই রীতি অব্যাহত ছিল। আর মৃত্যুর পূর্বে সজ্ঞানে শেষ প্রবন্ধ লিখে গেছেন একাশি বছরে পা দিয়ে— 'সভ্যতার সংকট'ই সম্ভবত তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এই সুদীর্ঘকালে বাংলা ভাষাকে তিনি নিজের মতো করে বারবার গড়ে নিয়েছেন। এই দীর্ঘকাল তাঁর ভাবনা - চিন্তা-মনন ক্রমশ পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। প্রবন্ধের সংজ্ঞা ও স্বরূপ তিনি নিজের প্রতিভা ও প্রকাশকৌশলে তৈরি করে নিয়েছেন। বারবার

নিজের রীতিপ্রকৃতিকে ভেঙে বদলে নতুন করে গড়ে নিয়েছেন তিনি। তাই তাঁর প্রবন্ধ সম্পর্কে এককথায় কোনো পরিচিতি দেওয়া যায় না— একহলমায় তাঁর প্রবন্ধের চেহারা স্পষ্ট করে তোলা যায় না।

সাধারণত প্রবন্ধ বলতে আমরা বুঝি জ্ঞানগর্ভ গদ্যরচনা, যার উদ্দেশ্য তথ্যপ্রমাণের দ্বারা কোনো কিছু প্রচার করা, প্রতিষ্ঠিত করা, বিতর্কের সাহায্যে কোনো প্রতিপক্ষ বক্তব্যকে খণ্ডন করা, নতুন যুক্তির আঘাতে অভ্যস্ত কোনো বিষয়কে ধরাশায়ী করে নতুন বিষয় বা সিদ্ধান্তকে উপস্থাপিত করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য সর্বদা প্রবন্ধের এই শর্ত পূরণ করে না। তিনি নিঃসন্দেহে মনস্বী, কিন্তু বিদ্যাভিমানী নন। অর্থাৎ তিনি পাঠককে জ্ঞানদান করার জন্য প্রবন্ধ লেখেন না। তাঁর প্রবন্ধ তাঁর ব্যক্তিমনের ভাবনায় আলোকিত; তা আমাদের প্রসন্ন করে, উদ্রিক্ত করে, চিন্তিত করে— কিন্তু বিষয়ের গুণে ততটা নয় যতটা বক্তা অর্থাৎ লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রসাদগুণে। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বপ্রধান প্রাবন্ধিক। তাঁর প্রবন্ধে আমরা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। সেই মহান পুরুষের অনুপম বাগ্‌ভঙ্গি, তাঁর কবিত্বপূর্ণ ভাষা, তাঁর রোমাঞ্চকর আলংকারিকতা, তাঁর পরিহাসচেতনা প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে স্বাদু করে তোলে, হঠাৎ হাওয়ার ঝলকানিতে পাঠকচিত্তকে ঝলমল করে তোলে। যে-কোনো তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করতে সাহস তিনি আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে, একপ্রকাশ সম্বোধনাত্মক রীতি প্রয়োগ করে বসেন। দু-একটি দৃষ্টান্ত এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। ধর্মগ্রন্থে 'ধর্মের সরল আদর্শ' নামক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করে ধর্মের সরল আদর্শ বিশ্লেষণ - সূত্রে সহসা একটি যেন স্তবমন্ত্র রচনা করে বসেছেন—

> ''হে অনন্ত বিশ্বসংসারের পরম এক পরমাত্মন্ তুমি আমার সমস্ত চিত্তকে গ্রহণ করো। তুমি সমস্ত জগতের সঙ্গে আমাকেও পূর্ণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছ, তোমার সেই পূর্ণতা আমি আমার দেহ-মনে, অন্তরে - বাহিরে জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে যেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি।'৪

এই হল রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধের ভাষা। বিচিত্র প্রবন্ধের 'আষাঢ়' প্রবন্ধটি কবি লিখেছেন তিপ্পান্ন বছর বয়সে। বিষয়বস্তু, ঋতু হিসাবে আষাঢ়ের স্বাতন্ত্র্য-নিরূপণ। কবির মতো, আষাঢ় ঋতুটা নিতান্তই অকাজের, নিষ্প্রয়োজনের, কিন্তু নিষ্প্রয়োজনেই হৃদয়ের আনন্দ—তাই আষাঢ়ের সঙ্গে জন্ম নিয়েছে সংগীত, রাগরাগিণী। যেখানে গতি সেইখানেই যতি, যেখানে কাজ সেখানেই অবকাশ? এমনি ধরনের গভীর দার্শনিক তত্ত্বে প্রবন্ধটি পরিপূর্ণ, কিন্তু কোথাও তা ভারবাহী হয়ে ওঠেনি। সবুজপত্রের যুগে লেখা এই সরস সহাস্য প্রবন্ধটি শেষ করেছেন একেবারে নিজস্ব ভঙ্গিতে—

''এত কথা যে বলিতে হইল তাহার কারণ কবিশেখর কালিদাস যে আষাঢ়কে আপনার মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দের অম্লান মালাটি পরাইয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাকে ব্যস্ত লোকেরা আষাঢ়ে বলিয়া অবজ্ঞা করে। ...সকল কাজের বাহিরের যে দলটি, যে অহেতুকী স্বর্গসভায় আসন লইয়া বাজে-কথার অমৃত পান করিতেছে, কিশোর আষাঢ় যদি আপন আলোককুন্তলে নবমালতীর মালা জড়াইয়া সেই সভার নীলকান্তমণির পেয়ালা ভরিবার ভার লইয়া থাকে, তবে স্বাগত হে নবঘনশ্যাম, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। এসো এসো জগতের যত অকর্মণ্য, এসো এসো ভাবের ভাবুক, রসের রসিক— আষাঢ়ের মৃদঙ্গ ওই বাজিল, এসো সমস্ত খোকার দল, তোমাদের নাচের ডাক পড়িয়াছে।...এসো গো অভিসারিকা, কাজের সংসারে কপাট পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্যুতের আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে— জাতীপুষ্পসুগন্ধিবনান্ত হইতে সজল বাতাসে আহ্বান আসিল— কোন ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা।''

সাধু চলিত দুই ভাষাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখেছেন। জীবনের মধ্যপর্ব থেকে সাধুভাষার ব্যবহার আর তিনি করেননি—পঞ্চাশ বছর বয়স থেকে চলিত ভাষাই তাঁর প্রবন্ধের বাহন হয়েছে। অবশ্য প্রথম জীবনে চিঠিপত্র, ডায়ারি, ভ্রমণ-জাতীয় রচনায় তিনি প্রায়শই চলিত গদ্য ব্যবহার করেছেন। সাধুভাষায় লেখা প্রবন্ধে তাঁর বাক্যগঠন সাধারণত দীর্ঘ, তৎসম শব্দের ব্যবহার প্রচুর, প্রয়োজনমতো সমাসবদ্ধ পদও ব্যবহৃত। চলিত ভাষার প্রবন্ধে তাঁর ভাষাভঙ্গি শাণিত, বুদ্ধিদীপ্ত, পরিহাসপ্রদীপ্ত। তবে সাধুভাষার প্রবন্ধেও পরিহাসের অভাব নেই। পঞ্চভূতের 'মন' প্রবন্ধটি থেকে তার একটি উদাহরণ সংকলন করা যেতে পারে।

''এই সমস্ত কাণ্ড! গেল বেচারার ফুল ফোটানো, রসশস্যপূর্ণ আতাফল পাকানো। যাহা আছে তাহা অপেক্ষা বেশি হইবার চেষ্টা করিয়া, যেরকম আছে আর এক রকম হইবার ইচ্ছা করিয়া, না হয় এদিক না হয় ওদিক। অবেশেষে হঠাৎ অন্তর্বেদনায় গুঁড়ি হইতে অগ্রশাখা পর্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া বাহির হয় একটা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা, আরণ্য সমাজ সম্বন্ধে একটা অসাময়িক তত্ত্বোপদেশ। তাহার মধ্যে না থাকে সেই পল্লবমর্মর, না থাকে সেই ছায়া, না থাকে সর্বাঙ্গব্যাপ্ত সরস সম্পূর্ণতা।''

''ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে কী লক্ষীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন একী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।''

আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধের সর্বোত্তম উদাহরণ 'জীবনস্মৃতি', সাধুভাষায় রবীন্দ্রনাথের অনুপম সৃষ্টি। স্মৃতিচারণার স্বগত ভঙ্গিতে সরস - স্নিগ্ধ কৌতুকে অবগাঢ়তায়, রসে - রহস্যে, চিত্রধার্মিতায়, ঔজ্জ্বল্যে এই স্বর্ণকান্তি ভাষা রবীন্দ্রনাথ আর দ্বিতীয়বার রচনা করেননি বলে মনে হয়। আবার এই একই স্মৃতিচারণায় 'ছেলেবেলা'য় ভাষা হয়েছে কথকতা, তাতে স্মিত কৌতুক ও বিষণ্ণ বেদনা দুইই মিশে গেছে। পত্রাবলীর আকারে - প্রকরণে রচিত ভ্রমণ-অভিজ্ঞতামূলক রচনা সাধারণ চলিত গদ্যেই লেখা, তবে 'পথের সঞ্চয়' নামক প্রবন্ধগ্রন্থটি এর ব্যতিক্রম। আবার মহাপুরুষ প্রসঙ্গ বা জীবনীমূলক প্রবন্ধ— বুদ্ধদেব খৃষ্ট রামমোহন বিদ্যাসাগর গান্ধী সম্পর্কিত প্রবন্ধটি সাধু ও চলিত দুই ভাষাতেই লেখা। বিজ্ঞানের দুরূহ জটিল তত্ত্ব কত সরস স্বাদুতায় মৌখিক গদ্যবাণীতে রূপান্তরিত করা যায়, 'বিশ্বপরিচয়' তাঁর অসামান্য দৃষ্টান্ত। সাধুভাষার সাহিত্য সমালোচনাকে কত সুরসায়িত করা যায় 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধটি তার নমুনা।

।।তিন।।

সাধারণত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, তথ্যবিন্যাসে, যুক্তিপরম্পরায় সিদ্ধান্ত-প্রতিপাদনে প্রবন্ধ কার পাঠকের বুদ্ধি ও মননের কাছে আবেদন জানান এবং স্বয়ং নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্ত ভূমিকা অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব প্রাধান্য পায় তা তো আমরা আগেই দেখেছি। অনেকেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ জীবনে বহু প্রবন্ধ লিখিত ভাষণ আকারে প্রকাশ্য সভা সমিতিতে পাঠ করেছিলেন। সেজন্য তাঁর প্রবন্ধের কোথাও কোথাও সেই ভাষণের বাচনধর্মিতা, যেন প্রত্যক্ষ শ্রোতাকে লক্ষ্য করে বলার একটা অলক্ষ্য ভঙ্গি প্রবন্ধের মধ্যে থেকে গেছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগ ঘোষণার পূর্বে লর্ড কার্জন বাঙালির চারিত্রিক দুর্বলতা বিষয়ে কিছু তির্যক মন্তব্য করার জন্য শিক্ষিত বঙ্গবাসী ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তারই প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'অত্যুক্তি' নামে একটি অসাধারণ প্রবন্ধ, যেখানে তাঁর ক্রোধ, ইংরাজের দম্ভোক্তির বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ঘৃণা তিনি সূচীতীক্ষ্ণ ভাষায় ধিক্কৃত বাগ্‌বিস্তারে প্রকাশ করেছেন অথচ প্রবন্ধকারের অপেক্ষাকৃত গাম্ভীর্য ও নিস্পৃহতাকেও ত্যাগ করেননি। যেমন ক্রোধে-বিদ্রূপে মাখানো অথচ আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ এই ভাষাগুলির দিকে মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে—

''প্রাচ্য অত্যুক্তি মানসিক ঢিলামি। আমরা কিছু প্রাচুর্যপ্রিয়, আঁটাআঁটি আমাদের সহে না। দেখো না, আমাদের কাপড়গুলা ঢিলাঢালা, আবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি; ইংরেজের বেশভূষা কাটাছাঁটা, ঠিক মাপসই— এমনকি আমাদের মতো তাহা আঁটিতে আঁটিতে কাটিতে কাটিতে শালীনতার সীমা ছাড়াইয়া গেছে। আমরা-হয় প্রচুররূপে নগ্ন নয় প্রচুররূপে আবৃত। আমাদের কথাবার্তাও সেই ধরনের— হয় একেবারে মৌনের কাছাকাছি নয় উদারভাবে সুবিস্তৃত। আমাদের ব্যবহারও তাই, হয় অতিশয় সংযত নয় হৃদয়াবেগে উচ্ছ্বসিত।

কিন্তু ইংরেজের অত্যুক্তির সেই স্বাভাবিক প্রাচুর্য নাই; তাহা অত্যুক্তি হইলেও খর্বকায়। তাহা আপনার অমূলকতাকে নিপুণভাবে মাটি চাপা দিয়া ঠিক সমূলকতার মতো সাজাইয়া তুলিতে পারে। প্রাচ্য অত্যুক্তির 'অতি টুকুই শোভা, তাহাই তাহার অলংকার, সুতরাং তাহা অসংকোচে বাহিরে আপনাকে ঘোষণা করে। ইংরেজি অত্যুক্তির 'অতি'টুকুই গভীরভাবে ভিতরে থাকিযা যায়; বাহিরে তাহার বাস্তবের সংযত সাজ পরিয়া খাঁটি সত্যের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া পড়ে।''

হঠাৎ মনে হয় ইংরেজ ও বাঙালি চরিত্রের এই তুলনামূলক আলোচনা বস্তুতই যেন খুব চিন্তাশীল, জাতীয় চরিত্রের বিচারমূলক বিশ্লেষণ। এই গাম্ভীর্যের মুখোশের তলায় রয়েছে একটি ঘৃণা ও বিদ্রুপের তীব্র আক্রমণ। ইংরাজের মিথ্যাচার, সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিকতা ও সত্য - গোপনের দুশ্চরিত্রতাকে কী নিদারুণ বিদ্রূপ করেছেন কবি এই প্রবন্ধ টিতে—

''আমরা হইলে বলিতাম অন্ধকূপের মধ্যে হাজার লোক মরিয়াছে। সংবাদটাকে একেবারে এক ঠেলায়

অত্যুক্তির মাঝদরিয়ার মধ্যে রওনা করিয়া দিতাম। হলওয়েল সাহেব একেবারে জনসংখ্যা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট করিয়া তাহার তালিকা দিয়া অন্ধকূপের আয়তন একেবারে ফুট হিসাবে গণনা করিয়া দিয়াছেন। যেন সত্যের মধ্যে কোথাও কোনো ছিদ্র নাই। হলওয়েলের মিথ্যা যে কত স্থানে কতরূপে ধরা পড়িয়াছে, তাহা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে ভালোরূপেই আলোচিত হইয়াছে। আমাদের উপদেষ্টা কার্জন সাহেবের নিকট স্পর্ধা পাইয়া হলওয়েলের সেই অত্যুক্তি রাজপথের মাঝখানে মাটি ফঁড়িয়া স্বর্গের দিকে পাষাণ-অঙ্গুষ্ঠ উত্থাপিত করিয়াছে।"

সাহিত্য সংগীত ছন্দ চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধগুলি লিখেছেন, সেগুলি ঠিক তাত্ত্বিক শাস্ত্রালোচনা নয়, কবির নিজেরই সৃষ্টির আনন্দ ও অভিজ্ঞতার আত্মসমীক্ষার অংশ। ১২৯৮ সালে লিখিত 'কাব্য' নামক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছিলেন, কাব্য - আস্বাদনে কিছু বিষয়ী মানুষ দর্শন - বিজ্ঞান-হিতকথা সন্ধানের অহেতুক মূঢ় চেষ্টা করে। কিন্তু "তত্ত্ব প্রচার করিয়া মানবের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি নাই, আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য তাহার হৃদয় সর্বদা ব্যগ্র হইয়া থাকে।" এই ভাষা প্রবন্ধ কারের, কিন্তু তারপরই যখন তিনি বলেন—

"হে বিষয়ী, হে সুবুদ্ধি প্রেমের কবিতা দেখিয়া তুমি যে বিজ্ঞভাবে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছ, বলিতেছ, উহার মধ্যে নতুন জ্ঞান কী আছে, তোমাকে অনুরোধ করি, তুমি তোমার সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান লইয়া মানবের এই পুরাতন প্রেমকে এমনি উজ্জ্বল মধুরভাবে ব্যক্ত করো দেখি। যাহা কিছুতে ধরা দিতে চায় না, সে মন্ত্রবলে ইহার মধ্যে ধরা দিয়াছে।"

এই অংশে যে স্বয়ং কবি ও স্রষ্টার অহংকৃত কণ্ঠস্বরই আমরা শুনতে পাই। বিহারীলালের কবিধর্ম বিশ্লেষণ করে তিনি লেখেন—

"আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন - অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং একটি গৃহবাসিনী অবরুদ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন জগতের সমস্ত নতুন নতুন দেশ ঘটনা এবং অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুলভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল, আর একজন শত সহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখি, আর-একজন খাঁচার পাখি। এই বনের পাখিটাই বেশি গান গাহিয়া থাকে। কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা, একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধ ভাবে এবং বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

এ যেন কবিরই আপন কবিসত্তার বিশ্লেষণ আর এই বিশ্লেষণের উপরই সোনার তরীর 'দুই পাখি' কবিতাটির প্রতিষ্ঠা। বিশেষভাবে স্মরণে আসে, সোনার তরীর দুই পাখি কবিতাটির পত্রিকায় প্রকাশকালে শিরোনাম ছিল 'নরনারী'।

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যালোচনা মূলত তাঁর আপন সাহিত্যসৃষ্টিরই সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য। কবির সংগীত - বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও বিশুদ্ধ সংগীতের সূত্রনিবদ্ধ বৈয়াকরণ বিশ্লেষণ নয়। কবির নিজস্ব সংগীতসৃষ্টিরই রহস্য তিনি নিবন্ধ করেছেন তাঁর 'সংগীতচিন্তা'র পৃষ্ঠায়। রাজনীতি - সমাজনীতি - সমবায়নীতি বিষয়ে কবি দীর্ঘকাল যা ভেবেছেন, নিজে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তাই প্রবন্ধে অকপটে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ছন্দ - বিষয়ক প্রবন্ধ, শব্দতত্ত্বের আলোচনা, ভাষাবিজ্ঞানের পর্যালোচনা — সে সব ক্ষেত্রেই তাঁর আলোচনা হয়ে উঠেছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। কোথাও তিনি শিক্ষক নন, কোথাও তিনি প্রচারক নন, সর্বত্রই তিনি যেন ভাষ্যকার, অভিজ্ঞতার টীকাকার, আপন সৃষ্টির রহস্যের নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক উন্মেষকার। তাঁর ধর্ম ও দর্শন আলোচনা কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বা দর্শনপ্রস্থান অনুসরণ করে না, তা কোনও তাত্ত্বিক বিচার নয়। তাঁর কবিদৃষ্টিতে তাঁরই উপলব্ধিতে বিষয়টিকে যেভাবে তিনি নিরীক্ষণ করেছেন, তাই তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি ও ভাষায় ব্যক্ত করেছেন মাত্র। এইজন্যই প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ কবি রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিবেশী। তাঁর কবিত্বের হিরণ্ময় জ্যোতিতে তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তাও জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে।